কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

পঞ্চমশক্তি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

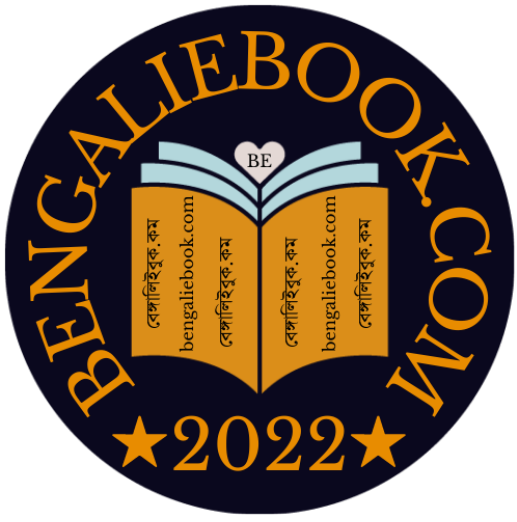

পঞ্চমশক্তি

বিকেলবেলাটা যে এমন সুন্দর ঝকঝকে হয়ে উঠবে, আশাই করিনি। সকাল থেকে ছিল একঘেয়ে বৃষ্টি আর কুয়াশা। আর সে কী ঘন কুয়াশা! আমাদের দেশে এমন কুয়াশা কখনও দেখিনি। চার-পাঁচ হাত দূর থেকে একটা গাড়ি চলে গেলেও বোঝা যায় না।

ছুটির দিন। ভাস্কর আমাকে এক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছিল। কিন্তু সকাল বেলা ওইরকম আবহাওয়া দেখে মনে হয়েছিল, এর মধ্যে আর কোথাও বেরুনো যাবে না। তিনদিন আগে আমি ভাস্করের লন্ডনের বাড়িতে পৌঁছেছি, কোথাও ঘোরাঘুরি করা হয়নি, শুধু আড্ডাই চলছে বাড়িতে বসে-বসে।

বিকেলবেলা রোদ উঠল, আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল।

ভাস্কর বললে, চল, তা হলে বেরিয়ে পড়া যাক। সবাই তো বিলেতে এসে রাজা রানির বাড়ি, ব্রিটিশ মিউজিয়াম আর মাদাম তুসোর মোমের পুতুলগুলো দেখে। তোকে আমি এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাব, যেখানে সাধারণত কেউ যায় না। সারাজীবন সে জায়গাটার কথা ভুলতে পারবি না।

আমি জিগ্যেস করলাম, কোন জায়গা?

ভাস্কর রহস্যময় ভাবে হেসে বললে, এখন বলব না। আগে চল তো।

গ্যারাজ থেকে ভাস্কর ওর লাল রঙের গাড়িটা বার করল। আমি ওর পাশে বসে সীট-বেল্ট বেঁধে নিলুম।

রোদ উঠেছে বলে রাস্তায় একসঙ্গে অনেক গাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। এ দেশে রোদ খুব বেশি দিন দেখা যায় না বলে এ দেশের লোকেরা এমন দিনে বাড়িতে বসে থাকতে চায় না।

এইরকম দিনে ট্রাফিক জ্যামও হয় খুব।

ভাস্করের খুব জোরে গাড়ি চালানো অভ্যেস। জ্যামে আটকে পড়লে ও খুব অস্থির হয়ে ওঠে।

আমি এদেশে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসেছি। আমার কোনও ব্যস্ততা নেই। এদেশে তো আর গাড়ির মধ্যে বসে থাকলেও গরম লাগে না। বাইরে ফিনফিনে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। আমাদের দুজনের গায়েই ওভার কোট।

হাইওয়েতে পড়তে-পড়তেই অনেকটা সময় লেগে গেল। তারপর গাড়িটা ছুটল সত্তর মাইল স্পিডে।

এক জায়গায় লেখা লিঙ্কনশায়ার। ভাস্কর বড় রাস্তা ছেড়ে গাড়িটা বেঁকিয়ে দিল সেদিকে। এর মধ্যেই প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে।

আমি জিগ্যেস করলুম, লিঙ্কনশায়ারে কী আছে? তা ছাড়া সন্ধে হয়ে গেল, এখন আর কিছু কি দেখা যাবে?

ভাস্কর বলল, আমরা যাচ্ছি একটা গাছ দেখতে। সন্ধে হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই।

আমি অবাক হয়ে বললুম, একটা গাছ দেখতে এত দূর আসা?

ভাস্কর বলল, 'উলসথ্রপ' ম্যানর', এই নামটা কি তোর চেনা-চেনা মনে হচ্ছে?

আমি দুবার উচ্চারণ করলুম, উলসপ ম্যানর! উলসপ ম্যানর! একটু যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। কোথায় শুনেছি বা পড়েছি এই নামটা, তা মনে পড়ল না।

ভাস্কর বলল, তুই ভুলে গেছিস। কলেজ-জীবনে তুই-ই আমাকে একখানা বই পড়তে দিয়েছিলি।

গাড়িখানা এসে থামল খুব পুরোনো আমলের একটা বাড়ির সামনে। পেছন দিকে একটা বাগান।

ভাস্কর কিন্তু বাড়িটার গেটের দিকে গেল না। আমাকে বলল, চল, আগে বাগানটা দেখে আসি। পেছন দিকে একটা গেট আছে আমি জানি!

আমি মনে-মনে খানিকটা হতাশই হয়ে উঠেছিলুম। এ কোথায় নিয়ে এল ভাস্কর? একটা অতি সাধারণ পুরোনো বাড়ি, আর বাগানটাও এমন কিছু না? এই দেখতে এত দূর আসা?

বাগানের মধ্যে ঢুকে একটা বেঁটে মতন গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভাস্কর প্রথমে বড় একটা নিশ্বাস টেনে বলল, আঃ!

তারপর সেই গাছতলায় কী যেন খুঁজতে লাগল।

আমি জিগ্যেস করলুম, এটা কী গাছ রে?

ভাস্কর বলল, এখনও চিনতে পারছিস না? এটা একটা আপেল গাছ। মানুষের। ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত দুটো গাছের মধ্যে এটা একটা।

আমি তখনও বুঝতে না পেরে বললুম, সবচেয়ে বিখ্যাত দুটো গাছ? কোনটা কোনটা?

ভাস্কর এবার সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে বললে, কলেজে পড়ায় সময় তুই আমাকে সবসময় জ্ঞান দিতিস! এবার চান্স পেয়ে আমি তোকে একটা জ্ঞান দিই? ইতিহাসের অতি বিখ্যাত গাছ একটা হচ্ছে, যে গাছের নীচে বসে কপিলাবস্তুর এক রাজকুমার, তাঁর। নাম ছিল সিদ্ধার্থ, তিনি গৌতম বুদ্ধ হয়েছিলেন। সেটার নাম হচ্ছে বোধিবৃক্ষ। সেই গাছটা আছে বিহারের বোধ গয়ায়। আর এটা হচ্ছে নিউটনের আপেল গাছ।

তখনই আমার মনে পড়ে গেল। উলসপ ম্যানর হচ্ছে নিউটনের জন্মস্থান।

মনে পড়ল এবং সঙ্গে-সঙ্গে আমার সারা শরীরে একটা রোমাঞ্চ হল। এই সেই আপেল গাছ? এই বাগানে নিউটন শুয়েছিলেন একদিন। হঠাৎ গাছ থেকে একটা আপেল খসে পড়ল মাটিতে। নিউটন সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। গাছের ফল সবসময় সোজা পড়ে মাটিতে। কখনো ডানদিকে কিংবা বাঁদিকে বেঁকে যায় না। পৃথিবীর কেন্দ্রের একটা শক্তি তাকে টানে।

সেই থেকে তিনি আবিষ্কার করলেন গ্র্যাভিটেশান, অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব!

কী বিরাট সেই আবিষ্কার! এই প্রকৃতির অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা গেল ওই মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব দিয়ে। চাঁদটা পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে ওই জন্যে। চাঁদ আর পৃথিবী একসঙ্গে সূর্যের চারপাশে বছর বছর একইরকম ভাবে ঘুরছে ওই জন্যে। আবার সব কটা গ্রহ নিয়ে সুর্যও ঘুরছে এই গ্যালাক্সিতে, আবার এই মহাবিশ্বে, অনন্ত আকাশে সমস্ত গ্রহ তারাপুঞ্জই পরস্পরকে এইভাবে টেনে রেখেছে।

আমার ঘোর ভাঙিয়ে দিয়ে ভাস্কর বললে, নিউটন জন্মেছিলেন ১৬৪২ সালে। অতদিন একটা আপেল গাছ তো আর বাঁচে না। আসল গাছটার ডাল কেটে কেটে গ্র্যাফটিং করে করে গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। এটার কথা অনেকেই জানে না।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভাস্কর মাটি থেকে একটা আপেল কুড়িয়ে আনল।

এখন আপেল পাকবার সময় হয়েছে। আপেল এত সস্তা যে অনেকেই খেতে চায় না। এরকম গাছ থেকে অনেক আপেল খসে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে এদেশে।

ভাস্কর আপেলটায় এক কামড় দিয়ে বলল, এঃ, বাজে খেতে! নিউটন নিশ্চয়ই এ আপেল খাননি কখনো।

আমিও আপেলটার অন্য দিকে একটা কামড় দিয়ে দেখলুম, সত্যিই কষা-কষা স্বাদ। গন্ধটাও ভালো না।

একটা সাধারণ আপেল গাছ বিজ্ঞানের কী বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে।

বাগানের একপাশে আরও কয়েকজন লোক রয়েছে। তার মধ্যে একজন বসে আছে একটা হুইল চেয়ারে। কম্বল দিয়ে গা ঢাকা। খুব কাশছে লোকটি। মনে হয় খুবই অসুস্থ। এই ঠান্ডার মধ্যে একজন অসুস্থ লোককে এখানে নিয়ে এসেছে কেন কে জানে!

আরও একটুক্ষণ বাগানে কাটিয়ে, বাড়িটা ঘুরে দেখে আমরা বেরিয়ে এলাম। আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। এদেশের আবহাওয়া এরকমই। কখন যে রোদ উঠবে, আর কখন তুষারপাত শুরু হবে, তার কোনও ঠিক নেই।

গাড়িতে উঠে ভাস্কর বলল, আজ রাতে লন্ডনে না ফিরে গিয়ে একটা কাজ করা যেতে পারে। এখানেই রাতটা থেকে যাবি? এখানে বেশ সুন্দর ছোট্ট-ছোট্ট সরাইখানা আছে।

আমার কোনও আপত্তি নেই। ভালোই হবে, একটা বিলিতি সরাইখানায় থাকার অভিজ্ঞতা হবে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ভাস্কর বলল, কলেজে পড়ার সময় তুই আমাকে আইজ্যাক নিউটনের একটা জীবনী পড়তে দিয়েছিলি। তখনকার একটা ঘটনা আমার মনে আছে। বইখানা একবার আমার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। আমি ঝুঁকে বইখানা বাঁ-হাতে দিয়ে তুলোম। তুই তখন বললি, এই ভাস্কর, তুই এই যে অবহেলায় বাঁ হাত দিয়ে বইটা তুললি, তার মানে তুই এই পৃথিবীর পুরো মাধ্যাকর্ষণ টান অগ্রাহ্য করলি। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ টান হচ্ছে, ৬,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ কিলোগ্রাম; কতগুলো শূন্য, তোর মনে আছে, সুনীল?

আমি হাসতে হাসতে বললুম, না রে! মনে নেই টাটকা-টাটকা বইখানা পড়ছিলুম তো। তোর তো বেশ মনে থাকে দেখছি!

ভাস্কর বলল, সেই থেকে আমি নিউটনের ভক্ত হয়ে গেছি। এখন সময় পেলেই বিজ্ঞানের বই আর পত্র-পত্রিকা পড়ি। নিউটনের সম্পর্কে নতুন কিছু বেরুলে কেটে রেখে দিই।

আমরা এসে উঠলুম ছোট্ট একটা সরাইখানায়। ওপর নিচে চারখানা মেটে ঘর। প্রত্যেকটা ঘর ভারি চমৎকার সাজানো। দেখলে মনে হয়, দুশো-তিনশো বছর আগেকার ইংল্যান্ড। এক কোণে ফায়ার প্লেস জ্বলছে। দেয়ালে পুরোনো আমলের ছবি। ম্যান্টলসিপের ওপর দুটি ছোট-ছোট শ্বেতপাথরের মূর্তি। একটা গ্যালিলিও আর একটা নিউটনের। গ্যালিলিও যেদিন মারা যান, সেদিনই নিউটন জন্মেছিলেন। কী আশ্চর্য যোগাযোগ। বিজ্ঞানের জগতে এঁরা যেন পিতা আর পুত্র।

আমাকে ঘরে বসিয়ে রেখে ভাস্কর নিচে গেল খাবার-দাবারের কথা বলে আসতে। অন্য হোটেলের মতন এখানে কোনও বেয়ারা নেই, বেল দিয়ে কাউকে ডাকা যায় না। এক স্বামী-স্ত্রী সরাইখানাটি চালান, কিছু দরকার হলে তাদের কাছ থেকে চেয়ে আনতে হয়।

ভাস্কর ফিরল বেশ দেরি করে।

চোখ বড়-বড় করে বলল, নিউটনের বাড়ির বাগানে আমরা যে হুইল চেয়ারে বসা একজন অসুস্থ লোককে দেখলুম, সেই লোকটিও এই জায়গায় এসে উঠেছে। উনি কে জানিস? উনি হলেন জেমস পেট্রেল!

আমি জিগ্যেস করলুম, তিনি কে ভাই?

ভাস্কর বলল, তুই জেমস পেট্রেল-এর নাম শুনিসনি?

আমি আবার দুদিকে মাথা নাড়ালুম।

ভাস্কর বলল, তুই এফ্রাইস ফিসবাখ-এর নাম শুনেছিস নিশ্চয়ই!

আমি কঁচুমাচু মুখে বললুম, তাও শুনিনি রে! এরা খুব বিখ্যাত লোক বুঝি?

ভাস্কর বলল, এফ্রাইস ফিসবাখ বিজ্ঞানের জগতে একটা ঝড় তুলে দিয়েছেন। আমেরিকার ইন্ডিয়ানাতে পারভিউ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটা পরীক্ষা করে নিউটনের

থিয়োরিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। এঁরা দাবি করেছেন যে প্রকৃতিকে একটা পঞ্চম শক্তি আছে।

আমি বলুলম, পঞ্চম শক্তিটাই বা কী ব্যাপার? আমার ঠিক ধারণা নেই রে! আমি তো বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম না?

ভাস্কর ধমক দিয়ে বললে, আজকাল সবকিছু বিজ্ঞানের খবর রাখা উচিত। বিজ্ঞানের জোরেই মানুষের শক্তি আজ কোথায় পৌঁছেছে। প্রকৃতির যে চারটি শক্তি প্রকাশিত হয়ে গেছে, তা তুই জানিস তো।

আমি বললুম, এক সময় পড়েছিলুম বটে, ভালো মনে নেই। একটু সোজা করে বুঝিয়ে দে।

ভাস্কর বলল, প্রথমটাই হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। এই যে একটা জিনিস আর একটা জিনিসকে টানছে, কিন্তু কীভাবে টানছে তা আজও ভালো করে বোঝা যায়নি। দ্বিতীয় হল ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম তার মানে বিদ্যুত-চুম্বক আলো একসঙ্গে। তৃতীয় হচ্ছে সেই প্রবল শক্তি যা, পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলোকে একসঙ্গে ধরে রাখে, আর চতুর্থ হল রেডিও অ্যাকটিভ ধ্বংসের যে শক্তি। পঞ্চমশক্তি

আমি বললুম, আর একটু সহজ করে বোঝানো যায় না?

ভাস্কর বললে, আর বোঝাতে পারছি না। বই দেব, পড়ে নিস। এবার আসল কথাটা শোন। ওই ফিসবাখ দাবি করেছেন, মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত আর একটা শক্তি আছে। অ্যান্টি গ্যাভিটি ফোর্স। সেই পঞ্চম শক্তি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা চলছে। এখনও পুরোপুরি কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। জেমস পেট্রোল কিছুদিন আগে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি প্রমাণ করে দেখিয়ে দেবেন। কিন্তু তারপরেই ভদ্রলোক দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বোধহয় বাঁচবেন না।

অ্যান্টি গ্র্যাভিটি ফোর্সটা ঠিক কীরকম বলত?

খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিচ্ছি! এক্ষুনি আমাদের নিচে খেতে যেতে হবে। পরে আর খাবার পাওয়া যাবে না। চল। যেতে-যেতে বলি। মনে কর, একটা কাঠের বল আর একটা লোহার বল, এ দুটোকে যদি ওপর থেকে ফেলা যায়, তা হলে কোনটা আগে নিচে পড়বে?

এটা আমি জানি ভাই। গ্যালিলিওর এক্সপেরিমেন্টের মতন! লোহার বলটা ভারি বলে আগে পড়বে বলে মনে হয়। কিন্তু কোনও বায়ুশূন্য জায়গা থেকে যদি ফেলা যায়, তা হলে দুটোই একসঙ্গে নামবে। কারণ, মাধ্যাকর্ষণ দুটোকেই সমানভাবে টানছে।

এতদিন লোকে তাই জানত। কিন্তু এখন কিছু-কিছু বৈজ্ঞানিক বলছেন, সবসময় দুটো সমান ভাবে নাও পড়তে পারে। মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত একটা কোনও শক্তি আছে, যা কোনও-কোনও জিনিসকে ওপর দিকে টানে।

এসব আমার মাথায় ঢুকছে না। তা ওই জেমস পেট্রেল নামে বৈজ্ঞানিকটি অসুস্থ অবস্থায় এখানে এসেছেন কেন?

সঙ্গে ওর স্ত্রী এসেছেন। আরও দুজন শিষ্য এসেছেন। ওঁদের কাছে শুনলাম, জেমস পেট্রেল, নিউটনের থিয়োরির খুঁত ধরে যে প্রমাণ দেবেন, তা এখানেই ওই আপেল গাছের তলাতেই দেখাতে চেয়েছিলেন। তাহলে সারা পৃথিবীতে ওঁর নাম ছড়িয়ে পড়ত। কিন্তু উনি সে সময় পেলেন না। পরীক্ষা সম্পূর্ণ হল না। তাই উনি নিউটনের কাছে হার স্বীকার করে এখানে মরতে এসেছেন।

আহা রে!

আমরা নেমে এলাম খাওয়ার ঘরে।

এখানে তিনটি টেবিল। এর পাশের টেবিলে হুইল চেয়ার নিয়েই বসেছেন জেমস পেট্রেল, তার পাশে তার স্ত্রী, আর দুজন লোক। পর দিকের টেবিলে বসে আছে একা একজন

মানুষ। খানিকটা পাশ ফিরে তার মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু মাথা ভর্তি চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছ, বিচারকদের উইমার মতন।

মাঝখানের টেবিলটা খালি, আমরা বসলাম সেখানে।

খাবার-দাবার আগে থেকেই সাজানো রয়েছে টেবিলের ওপর। আমরা কৌতূহলী হয়ে দেখতে পেলাম জেমস পেট্রেলকে। ওর মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে, কিছুই খেতে পারলেন না। বোঝা যাচ্ছে অবস্থা খুবই খারাপ, এই অবস্থায় ওঁকে এই খাওয়ার টেবিলে আনার কোনও মানে হয়?

বোধহয় আমাদের মনের কথা বুঝতে পেরেই ওই পাশের টেবিল থেকে জেমস পেট্রেলের একজন শিষ্য ফিসফিস করে বললেন, উনি কিছুতেই ঘরে থাকতে চাইছেন না। জেদ ধরেছেন, এখানেই বসবেন।

আমরা খাবারে মনোযোগ দিলুম। অন্য টেবিলের একা ব্যক্তিটি এদিকে একবারও তাকাচ্ছেন না। তার মুখও দেখা যাচ্ছে না।

আমি ভাস্করকে জিগ্যেস করলুম, ওই লোকটি কে।

ভাস্কর বলল, কী জানি। আগে দেখিনি, লোকটা কীরকম অভদ্র, পেছন ফিরে আছে আমাদের দিকে।

হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ শুনে আমরা চমকে উঠলুম।

জেমস পেট্রেল চেয়ার থেকে পড়ে গেছেন মাটিতে। আমরা সবাই উঠে গেলুম তার কাছে।

জেমস পেট্রেলের চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে গেছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, ঘনিয়ে এসেছে তার সময়। তিনি ফিসফিস করে বললেন, আমাকে আপেল গাছতলায় নিয়ে চলো।

ওঁর শিষ্যদের মধ্যে একজন ডাক্তার, তা বোঝা গেল, তিনি একটা স্টেথোসকোপ আরও কী সব যন্ত্রপাতি চট করে এনে পরীক্ষা করে দেখলেন জেমস পেট্রেলকে।

তারপরও তিনিও হতাশভাবে বললেন, ওঁর শেষ ইচ্ছে পালন করাই ভালো। আর কোনও আশা নেই।

জেমস পেট্রেলকে যখন ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাড়ির কাছে, তখন অন্য টেবিলের সেই বড় চুলওয়ালা লোকটি এসে বলল, আমিও কি যেতে পারি আপনাদের সঙ্গে।

কেউ হ্যাঁ-ও বলল না, না-ও বলল না।

আমি আর ভাস্করও খাবার খেতে-খেতে উঠে এলাম। জেমস পেট্রেলের জীবনের শেষ দৃশ্যটি দেখার জন্য আমাদেরও খুব কৌতূহল হল। আহা, একজন বৈজ্ঞানিক গভীর দুঃখ নিয়ে মরতে যাচ্ছেন। জ্ঞান সম্পূর্ণ হল না।

উলসথ্রপ ম্যানর-এর বাগানে বেশ ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে এই রাতেও। জেমস পেট্রেলকে শোওয়ানো হয়েছে সেই বিখ্যাত আপেল গাছটার নিচে। ওর এখনও জ্ঞান আছে। উনি ফিসফিস করে বলছেন, আইজাক নিউটন, আপনি আমাদের সব বৈজ্ঞানিকদের গুরু। তবু আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আপনার যোগ্য শিষ্য হওয়ার আশা করেছিলাম। কিন্তু সময় পেলাম না। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।

এর মধ্যে কে যেন বেশ জোরে চেঁচিয়ে বলল, এক মিনিট, এক মিনিট।

সেই বড়-বড় চুলওয়ালা লোকটা এগিয়ে এল ভিড় ঠেলে। ওভার কোটের পকেট থেকে বার করল একটা মস্ত বড় টর্চ।

জেমস পেট্রেলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে সেই লোকটি খুব পুরোনো ধরনের ইংরিজিতে বললে, দাউ মাস্ট নট ল্যামেন্ট, জেমস পেট্রেল তুমি একজন সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক,

নিউটনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তুমি উচিত কাজই করেছ। তোমার থিয়োরিও মিথ্যে নয়। এই দ্যাখো!

লোকটি আপেল গাছের ওপরের দিকে জোরালো টর্চের আলো ফেলল।

তখন দেখা গেল একটা অদ্ভুত দৃশ্য।

সেই মুহূর্তেই গাছ থেকে খসে পড়ল একটা আপেল। কিন্তু সেটা পড়তে-পড়তেও ঝুলে রইল এক জায়গায়। থেমে গেল। আর পড়ছে না।

লোকটি বললে, দেখতে পাচ্ছ, জেমস পেট্রেল? অ্যান্টি গ্র্যাভিটি! আছে।

মুমূর্ষ জেমস পেট্রেল ফিসফিস করে বললেন, অবিশ্বাস্য! অবিশ্বাস্য!

তাড়াতাড়ি তার মাথাটা ঢলে পড়ল একদিকে। আপেলটাও পড়ে গেল মাটিতে।

ডাক্তারটি বলল, সব শেষ!

কিন্তু সেই লম্বা চুলওয়ালা লোকটিকে আর দেখা গেল না। সে ভিড়ের মধ্যে মিশে এর মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে।

জেমস পেট্রেলের মৃতদেহ সরাবার জন্য সময় গেল খানিকটা। অনেকেই এর মধ্যে সেই লোকটির খোঁজ করল, কিন্তু কোথাও আর পাওয়া গেল না তাকে। সে সরাইখানাতেও ফিরে যায়নি। সেখানে তার কোনও জিনিসপত্রও নেই। সে শুধু সেখানে খেতে এসেছিল।

আমাদের ঘরে ফিরে আসার পর আমি ভাস্করকে জিগ্যেস করলাম, ব্যাপারটা কী হল বল তো? নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না।

ভাস্কর কঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, কী আর হবে! অলৌকিক তো কিছু না। এটা বিজ্ঞানও নয়। অ্যান্টি গ্র্যাভিটি ফোর্স বলে কিছু থাকলেও আপেল শূন্যে ঝুলে থাকবে না ওরকমভাবে। এটা ম্যাজিক। ও লোকটা নিশ্চয়ই একজন ম্যাজিশিয়ান।

আমি বললুম, কিন্তু লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল কোথায়?

ভাস্কর বলল, সবাইকে একটা স্টান্ট দিয়ে লোকটা ব্যাপারটার ব্যাখ্যা চাইত! ম্যাজিক! ম্যাজিক! ম্যাজিশিয়ানরা কখনো তাদের খেলার ব্যাখ্যা দেয় না।

আমি বললুম, আমি কিন্তু ঠিক ম্যাজিক বলে মানতে পারছি না। এতগুলো লোক মিলে দেখলুম...আচ্ছা ভাস্কর, তুই লোকটার নাক লক্ষ করেছিলি?

ভাস্কর বলল, নাক? লোকটার নাক দিয়ে কী হবে?

আমি বললুম, কেমন যেন ফোলামতন না। অনেকটা বড়। মাথায় ওরকম ঝকড়া-ঝাঁকড়া চুল। বিচারকদের উইগের মতন। ছবিতে নিউটনের চেহারাটা ঠিক এইরকম না?

ঝট করে আমার দিকে ফিরে ভাস্কর জিগ্যেস করল, তুই কী বলছিস রে, সুনীল?

আমি বললুম, স্বয়ং নিউটনই আসেননি তো? একজন বৈজ্ঞানিক মনের দুঃখ নিয়ে মরে যাচ্ছে, তাই তিনি শেষ মুহূর্তে এসে সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন।

ভাস্কর বলল, তোর মাথা খারাপ। নিউটন ফিরে আসবেন কী করে। তুই কি ভূত-টুতে বিশ্বাস করিস নাকি?

আমি হেসে বললুম, হ্যামলেটের সেই লাইনগুলো মনে নেই? দেয়ার আর মোর থিংস ইন হেভেন অ্যান্ড আর্থ হেরেসিও...এই পৃথিবী ও বিশ্বলোকে এখনও এমন অনেক কিছু আছে, যা মানুষ কিংবা বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না। তাই না?